Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XV, Issue-I, October 2026, Page No. 09-17
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.15.issue.01W.131

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি: শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আলোকে একটি দার্শনিক আলোচনা

মৃন্ময় মন্ডল, *সহকারী অধ্যাপক, আনন্দ চন্দ্র কলেজ, জলপাইগুরি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 08.10.2026; Accepted: 15.10.2026; Available online: 31.10.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The Śrīmad Bhagavad gītā, a foundational text of Indian philosophy, offers a comprehensive framework for understanding human life through the integration of ethical, psychological, and spiritual dimensions. Central to its teachings are the concepts of *pravṛtti* (active engagement in worldly duties) and *nivṛtti* (detachment and spiritual withdrawal), which have traditionally been regarded as opposing paths. The gītā, however, presents a harmonious synthesis of these orientations through the doctrine of *niṣkāma karma* .

The text addresses Arjuna's moral and psychological crisis on the battlefield of kurukṣetra and emphasizes that liberation is attained not through the renunciation of action, but through the performance of one's duties without attachment to their outcomes. This paper examines the philosophical significance of *pravṛtti* and *nivṛtti*, analyzes the nature of Arjuna's dilemma, and explores the role of karma yoga, jñāna yoga, and bhakti yoga in reconciling these seemingly divergent paths. This will discuss Gītā's integrated vision of action and valuable insights for addressing ethical dilemmas, psychological challenges, and the ongoing crisis of values in modern society.

Keywords: Bhagavad Gītā, Pravṛtti, Niṣkāma Karma, Nivṛtti, Karma Yoga, Jñāna Yoga, Bhakti Yoga, Ethics.

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির এক অনন্য ও অমূল্য দার্শনিক গ্রন্থ, যা মানবজীবনের নৈতিক সংকট, কর্তব্যবোধ এবং আত্মঅনুসন্ধানের প্রশ্নকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে থাকে। মানুষের জীবন কেবল বাহ্যিক সাফল্য ও কর্মব্যস্ততার সমষ্টি নয়; এর মধ্যে রয়েছে নৈতিক দ্বন্দ্ব, মানসিক অস্থিরতা, অস্তিত্বের সংকট এবং আত্মপরিচয়ের জটিল প্রশ্ন। ব্যক্তি ও সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সংকটগুলির রূপ পরিবর্তিত হলেও তাদের মৌলিক তাৎপর্য আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি মানুষের জীবনকে অকল্পনীয়ভাবে সহজ ও গতিশীল করে তুললেও মানসিক উদ্বেগ, হতাশা, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং আত্মপরিচয়-সংক্রান্ত সংশয় মানুষের জীবনে ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। তাই বাহ্যিক সমৃদ্ধি ও মানসিক অস্থিরতার এই পারস্পরিক বৈপরীত্যের প্রেক্ষাপটে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দার্শনিক ভাবনা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। কারণ গীতা কেবল কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় নির্দেশ প্রদান করে না; বরং নৈতিক সংকটের মধ্যেও কীভাবে কর্তব্য সম্পাদন, আত্মসংযম, অনাসক্তি এবং আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে জীবনের একটি সুসমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা যায়, তার একটি গভীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পথনির্দেশ প্রদান করে। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে অন্তর্ভুক্ত 'গীতা' তাঁরই নিজস্ব দার্শনিক চিন্তাভাবনা ও আধ্যাত্মিকতার কারণে স্বতন্ত্র গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন যখন তার আত্মীয়- স্বজন ও গুরুবর্গকে দেখে মানসিকভাবে ভেঙে পরেন এবং তিনি যুদ্ধ

করবেন কি করবেন না– এই নৈতিক সংকটের সম্মুখীন হন তখন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে যে উপদেশ বাণী শুনিয়েছিলেন তা কেবলমাত্র যুদ্ধের নির্দেশ নয়, বরং তা ছিল সমগ্র মানবজাতির জন্য এক জীবনদর্শন। এই গীতা কেবলমাত্র একটি ধর্মীয় গ্রন্থ নয়; এটি মানবজীবনের একটি সামগ্রিক দার্শনিক ব্যাখ্যা এবং অর্জুনের সংকট হল প্রকৃতপক্ষে সেই সমগ্র মানবজাতির সংকটের প্রতীক। মানুষের জীবনে কর্ম, কর্তব্য,নৈতিকতা আত্মজ্ঞান, বৈরাগ্য ও মুক্তির মধ্য দিয়ে কিভাবে সমন্বয় সাধন করা যায় গীতা হল তারই একটা বাস্তব চিরন্তনবাণী বা দিক নির্দেশ।

আমাদের মানবজীবন মূলত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি- এই দুই প্রবণতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রবৃত্তি মানে কর্ম, কর্তব্য ও সংসারধর্ম পালন; অন্যদিকে নিবৃত্তি মানে কামনা–বাসনা ও ভোগলিপ্সা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মসংযম ও ধ্যানমগ্নতায় জীবনযাপনকে বোঝায়। ইতিহাস জুড়ে এই দুই প্রবণতাকে প্রায়শই বিপরীত পথ হিসেবে দেখা হয়েছে। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে— মানুষ কি সংসারধর্ম পালন করবে, নাকি সংসার ত্যাগ করে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করবে?

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এই দ্বন্দ্বের একটি স্বতন্ত্র ও তাৎপর্যপূর্ণ সমাধান সূত্রের সন্ধান করে থাকে। গীতায় বলে— কর্ম পরিত্যাগ নয়, বরং নিষ্কাম কর্মযোগের মাধ্যমে কর্মপথেই মুক্তি সম্ভব। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য প্রণিধাযোগ্য হতে পারে। বিবেকানন্দ তাঁর কর্মযোগ গ্রন্থে বলেছেন,

> "This is the one central idea in the Gita: work incessantly, but be not attached to it."[১]

মানুষের জীবনে সংসারধর্ম পালন করেও আসক্তিহীন থেকে আধ্যাত্মিক উন্নতি করা সম্ভব। এভাবেই শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মধ্যে সমন্বয় সাধনের এক সুসংবদ্ধ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছে। এই প্রবন্ধ মূলত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আলোকে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ধারণা, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং দার্শনিক ও নৈতিক তাৎপর্যের একটি সংক্ষিপ্ত দার্শনিক বিশ্লেষণ। এই আলোচনায় প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বলতে কি বোঝানো হয়েছে তা যেমন আলোচিত হবে তেমনি অর্জুনের নৈতিক ও অস্তিত্বগত সংকটের প্রেক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশবাণী প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মধ্যে কিভাবে সমন্বয়ের পথ নির্দেশ করে সেই আলোচনাও গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হবে।

"প্রবৃত্তি" শব্দটি সংস্কৃত "প্র + বৃৎ" ধাতু থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ অগ্রসর হওয়া বা কার্যকলাপে নিযুক্ত হওয়া। প্রবৃত্তির পথ মূলত কর্মমুখী জীবনকে নির্দেশ করে। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও মানবসমাজের প্রতি মানুষের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, সেগুলির যথাযথ পালনই প্রবৃত্তির মূল বৈশিষ্ট্য। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্ম থেকে পলায়ন না করার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন—

> "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।" (গীতা ৩.৫) [২]

অর্থাৎ, উক্ত শ্লোকটি মানবজীবনের অবিচ্ছিন্ন কর্মপ্রবণতার দার্শনিক ভিত্তি নির্দেশ করে। কর্ম মানব অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। মানুষ এক মুহূর্তের জন্য কর্ম ছাড়া থাকতে পারে না । কর্ম হল মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই কর্মত্যাগ নয়, বরং সঠিকভাবে কর্ম সম্পাদনই গীতার শিক্ষা। গীতার প্রবৃত্তিমূলক আদর্শের কেন্দ্রবিন্দু হলো "কর্মযোগ"। কর্মযোগে মানুষ নিজের কর্তব্য পালন করবে, কিন্তু ফলের প্রতি কোনো আসক্তি থাকবে না। শ্রী অরবিন্দ বলেন,

---

[১] Vivekananda.S, (2013). Karma-Yoga.Advaita Ashrama.

[২] প্রভুপাদ, এ, সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী। শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ । ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট । পৃষ্ঠা- ১৫৮

"The Gita does not preach an escape from life but a divine fulfilment of life."[৩]

অতএব কর্ম থেকে পলায়ন নয়, বরং কর্মকে সঠিকভাবে পরিচালনা করাই মানবজীবনের লক্ষ্য। গীতার এই কর্তব্যবোধকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে গিয়ে বলা হয় যে অর্জুন যখন যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে কর্মত্যাগ করতে বলেননি; বরং সেসময় তিনি স্বধর্ম পালনের নির্দেশ দিয়ে গীতায় বলেছেন—

"স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।"[৪]

(গীতা ৩.৩৫)

অর্থাৎ নিজের ধর্ম বা কর্তব্য পালনই শ্রেয়; অন্যের ধর্ম অনুসরণ করা বিপদ সংকুল ও বিপজ্জনক।

"নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।"[৫] (গীতা ৩.৮)

অর্থাৎ, "নিজস্ব কর্তব্যকর্ম পালন কর; কারণ কর্মই নিষ্ক্রিয়তার তুলনায় শ্রেয়।" গীতার এই শ্লোক নির্দেশ করে যে, মানুষকে তার স্বাভাবিক কর্ম বা কর্তব্য থেকে কখনোই পিছিয়ে যাওয়া উচিত নয়। কর্মত্যাগ বা নিষ্ক্রিয়তা আত্মোন্নতির পথ নয় বরং সক্রিয় কর্মপরায়ণতার মধ্য দিয়েই জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করা যায়। সুতরাং প্রবৃত্তি কোনো ভোগলালসা নয়, বরং দায়িত্বশীলতা এবং কর্তব্যপরায়ণতার প্রতীক। গীতার মতে, কর্মের মূল্য নির্ধারিত হয় তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের দ্বারা। যদি কর্ম কেবল ব্যক্তিগত লাভ বা অহংকারের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়, তবে তা বন্ধনের কারণ হয়। কিন্তু যদি কর্ম কর্তব্যবোধ ও লোকসংগ্রহের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়, তবে তা মুক্তির সহায়ক হয়ে ওঠে।

'নিবৃত্তি' শব্দের অর্থ প্রত্যাহার, সংযম বা বিরতি। দর্শনের ভাষায় এটি কামনা-বাসনা, ভোগলিপ্সা ও আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে অন্তর্মুখী সাধনার পথে অগ্রসর হওয়াকে বোঝায়।

"যোগী যুঞ্জীত সততম্ আত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকি যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ।"[৬]- (গীতা ৬.১০)

"যোগী সর্বদা ধ্যানযোগে আত্মনিষ্ঠ হবে; সে একাকী থাকবে, মন ও ইন্দ্রিয় সংযম করবে, আশা ও আসক্তি সম্পূর্ণ ত্যাগ করবে।"

এখানে 'নিবৃত্তি' শব্দটির দ্বারা আধ্যাত্মিক দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিবৃত্তি মানে সংসারত্যাগ নয়, বরং মানসিক সংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আসক্তিহীনতাকে বোঝায়। এর ফলে নিবৃত্তি ব্যক্তিকে মানসিক স্থিতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং আধ্যাত্মিকতার দিকে পরিচালিত করে। সুতরাং গীতা নিবৃত্তিকে নিছক কর্মবিমুখতা হিসেবে গ্রহণ করেনি। গীতায় বলা হয়েছে—

"যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোহঙ্গানীব সর্বশঃ।"[৭] (গীতা ২.৫৮)

অর্থাৎ কচ্ছপ যেমন নিজের অঙ্গসমূহ গুটিয়ে নেয়, তেমনি যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করতে পারে তিনিই জ্ঞানী। এখানে নিবৃত্তি মানে শুধু বাহ্যিক জগতকে ত্যাগ নয়; বরং অন্তরের আসক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করাকেও বোঝায়। শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

---

[৩] Aurobindo, S. (1997) Essays on the Gita. Sri Aurobindo Ashram p-8
[৪] রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী । ভাগবদগীতা ও বিশ্বজনীন বার্তা (১ম খণ্ড) কলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয় । পৃঃ-৩০৮
[৫] রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী । ভাগবদগীতা ও বিশ্বজনীন বার্তা (১ম খণ্ড) কলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয় । পৃঃ-২৫৮
[৬] রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী । ভাগবদগীতা ও বিশ্বজনীন বার্তা (২য় খণ্ড) কলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয় পৃঃ-১২৪
[৭] রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী । ভাগবদগীতা ও বিশ্বজনীন বার্তা (১ম খণ্ড) কলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয় । পৃঃ-২২০

"ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ।"[৮]

(গীতা ১৮.১১)

অর্থাৎ দেহধারী মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ কর্মত্যাগ সম্ভব নয়। তাই প্রকৃত ত্যাগ হলো— কর্মফলত্যাগ, অহংকারত্যাগ এবং আসক্তিত্যাগ। গীতার এই দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত বাস্তববাদী কারণ হল মানুষ সমাজে বসবাস করে; তাই সম্পূর্ণ কর্মবিমুখতা মানবজীবনের জন্য কখনোই উপযোগী নয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই সমগ্র শিক্ষার সূচনা হল অর্জুনের সংকটকে কেন্দ্র করে। এই সংকট কেবল একটি যুদ্ধক্ষেত্রের সাময়িক মানসিক দুর্বলতা নয়; বরং মানবজীবনের এক গভীর নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং দার্শনিক সমস্যার প্রতিচ্ছবি। এই সংকটের মধ্যেই মানবজীবনের চিরন্তন দ্বন্দ্ব নিহিত রয়েছে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হন যেখানে তাঁর ব্যক্তিগত আবেগ, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক দায়িত্ব এবং ধর্মীয় কর্তব্য পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থান নেয়। একজন ক্ষত্রিয় হিসেবে অন্যায় ও অধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তাঁর স্বধর্ম। এই কর্তব্যবোধ প্রবৃত্তিমার্গের প্রতিনিধিত্ব করে, যেখানে ব্যক্তি সমাজ ও ন্যায়ের স্বার্থে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে যখন তিনি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে দেখতে পান, তখন তাঁর মনে করুণা, শোক এবং বৈরাগ্যের উদ্ভব হয়। তিনি উপলব্ধি করেন যে এই যুদ্ধের ফল হবে রক্তপাত, পারিবারিক ধ্বংস এবং সামাজিক অস্থিরতা। ফলে তিনি যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ভাবতে শুরু করেন। এই অবস্থায় অর্জুনের মন নিবৃত্তিমুখী হয়ে ওঠে। তিনি রাজ্য, ক্ষমতা ও ভোগসুখের প্রতি অনাগ্রহ প্রকাশ করে বলেন—

"ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ"[৯] (১.৩১)

এখানে অর্জুনের বক্তব্য আপাতদৃষ্টিতে বৈরাগ্যপূর্ণ মনে হলেও গীতার দৃষ্টিতে এটি প্রকৃত নিবৃত্তি নয়। কারণ তাঁর এই অনাগ্রহ আত্মজ্ঞান বা সমত্ববোধের ফল নয়; বরং শোক, মোহ এবং মানসিক বিভ্রান্তির ফল। প্রকৃত নিবৃত্তি কখনোই মানুষের কর্তব্যবোধকে দুর্বল করে না, বরং তাকে অনাসক্ত ও জ্ঞানসম্পন্ন করে তোলে। অর্জুনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তিনি কর্তব্য থেকে সরে আসতে চাইছেন, যা কোনো অবস্থাতেই প্রকৃত বৈরাগ্যের লক্ষণ হতে পারে না। দার্শনিকভাবে বিচার করলে অর্জুনের সংকট হলো 'ধর্মসংকট'-এর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একদিকে ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুযায়ী যুদ্ধ করা তাঁর কর্তব্য; অন্যদিকে অহিংসা, পারিবারিক সম্পর্ক এবং করুণাবোধ তাঁকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করছে। অর্থাৎ তিনি দুটি নৈতিক মূল্যবোধের সংঘর্ষের মধ্যে আটকে পড়েছেন। আধুনিক নীতিবিদ্যায়যেটা হল একটি 'কর্তব্যের সংঘাত' বা Conflict of Duties- এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির আলোকে অর্জুনের সংকটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—তিনি এই দুই পথকে পরস্পরবিরোধী বলে মনে করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে যুদ্ধ করা মানেই প্রবৃত্তি, আর যুদ্ধ ত্যাগ করা মানেই নিবৃত্তি। কিন্তু এই ধারণা গীতার মতে ভুল। কারণ প্রকৃত সমস্যা কর্মে নয়, কর্মের প্রতি আসক্তিতে। এই উপলব্ধির অভাবই অর্জুনের সংকটের মূল কারণ। গীতার দার্শনিক তাৎপর্য এখানেই যে, এটি অর্জুনের সংকটকে একটি বৃহত্তর মানবিক সমস্যার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করে। প্রত্যেক মানুষের জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, যেখানে ব্যক্তিগত আবেগ ও সামাজিক দায়িত্ব, নিজেরস্বার্থ ও নৈতিক কর্তব্য, জাগতিক জীবন ও আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়। তাই অর্জুনের সংকটকে

[৮] রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী। ভাগবদগীতা ও বিশ্বজনীন বার্তা (৩য় খণ্ড) কলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়। পৃঃ-২৫৪

[৯] রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী। ভাগবদগীতা ও বিশ্বজনীন বার্তা (১ম খণ্ড) কলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়।পৃঃ-৭৫

গীতাতে মানবজীবনের নৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ সংক্রান্ত এক সার্বজনীন অস্তিত্বগত সমস্যার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

অর্জুনের সংকটের মধ্য দিয়েই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের সূচনা হয়। গীতার দার্শনিক গুরুত্ব এখানেই যে, এটি অর্জুনের সমস্যার সাময়িক বা আবেগনির্ভর সমাধান প্রদান করে না; বরং মানবজীবনের এক মৌলিক সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করে। অর্জুন যেখানে প্রবৃত্তি (কর্তব্যকর্ম) এবং নিবৃত্তি (কর্মত্যাগ বা বৈরাগ্য)-কে পরস্পরবিরোধী বলে মনে করেছিলেন, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ এই দুই পথের মধ্যে এক গভীর সমন্বয়ের শিক্ষা প্রদান করে গীতায় দেখান যে মানবজীবনের পরিপূর্ণতা কর্মপরিত্যাগে নয়, আবার কেবল কর্মমুখরতাতেও নয়; বরং অনাসক্তচিত্তে কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের মধ্যেই প্রকৃত জীবনদর্শন নিহিত আছে।

প্রথমত, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আত্মার নিত্যতা ও শরীরের অনিত্যতার শিক্ষা দেন। অর্জুনের শোক ও বিষাদের মূল কারণ ছিল আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুভয় এবং দেহকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ নায়ং ভূত্বাহভবিতা বা ন ভূয়ঃ।"[১০]

(গীতা ২.২০)

এই শ্লোকের মাধ্যমে কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেন যে আত্মা অবিনশ্বর, চিরন্তন এবং অক্ষয়। মৃত্যু কেবল শরীরের পরিবর্তন মাত্র। এই আত্মতত্ত্ব অর্জুনকে ব্যক্তিগত আবেগ ও মোহের সীমা অতিক্রম করে বৃহত্তর সত্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এই শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রকৃত নিবৃত্তি জগত থেকে পলায়নে নয়, বরং আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধিতে নিহিত থাকে।

দ্বিতীয়ত, শ্রীকৃষ্ণ স্বধর্ম পালনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং তিনি অর্জুনকে স্মরণ করিয়ে দেন যে একজন ক্ষত্রিয় হিসেবে ধর্মযুদ্ধ পরিচালনা তাঁর কর্তব্য। ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা আবেগের কারণে কর্তব্য থেকে সরে আসা নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেন—

"স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।"[11]

(গীতা ৩.৩৫)

এই বক্তব্যের মাধ্যমে কৃষ্ণ প্রবৃত্তিমার্গের নৈতিক গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষের জীবনে সামাজিক দায়িত্ব, নৈতিক কর্তব্য এবং কর্মের একটি অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে। তাই কর্ম থেকে পলায়ন নয়, বরং কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মই মানবজীবনের আদর্শ পথ।

তৃতীয়ত, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের কেন্দ্রবিন্দু হলো নিষ্কাম কর্মযোগ। গীতার অন্যতম বিখ্যাত শ্লোক—

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণি॥"[১২] (গীতা ২.৪৭)

এখানে কৃষ্ণ ঘোষণা করেন যে মানুষের অধিকার কেবল কর্মে, কর্মফলে নয়। এই শিক্ষাই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সমন্বয়ের মূল সূত্র। কর্ম করা প্রবৃত্তির লক্ষণ, আর কর্মফলের প্রতি অনাসক্তি নিবৃত্তির লক্ষণ। গীতার আদর্শ হলো—কর্মে প্রবৃত্ত হও এবং মনে নিবৃত্ত হও। অর্থাৎ মানুষ জগতে সক্রিয় থাকবে, কিন্তু তার মন ফললিপ্সা, অহংকার ও আসক্তি থেকে সদাসর্বদা মুক্ত হবে।

চতুর্থত, কৃষ্ণ কর্মত্যাগের ধারণাকে পুনর্ব্যাখ্যা করে বলেন—

---

[১০] রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী । ভাগবদগীতা ও বিশ্বজনীন বার্তা (১ম খণ্ড) কলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয় । পৃঃ-১২১

[১১] রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী । ভাগবদগীতা ও বিশ্বজনীন বার্তা (১ম খণ্ড) কলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়। পৃঃ-৩০৮

[১২] রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী । ভাগবদগীতা ও বিশ্বজনীন বার্তা (১ম খণ্ড) কলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয় পৃঃ-১৭৪

"ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।।"[১৩] (গীতা ৩.৪)

অর্থাৎ কর্ম না করে কেউ কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছাতে পারে না। এই শ্লোক গীতার অন্যতম মৌলিক দার্শনিক ঘোষণা। এখানে কৃষ্ণ দেখাতে চান যে প্রকৃত নিবৃত্তি কর্মবিমুখতা থেকে নয়; বরং কর্মের মধ্যেই অনাসক্তি অর্জন করে হয়। তাই গীতা সর্বদা বাহ্যিক সন্ন্যাসের পরিবর্তে অন্তর্মুখী বৈরাগ্যের শিক্ষাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। আরও স্পষ্টভাবে তিনি বলেন—

"অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ..."[১৪] (গীতা ৬.১)

অর্থাৎ যিনি কর্মফলের প্রতি নির্ভর না করে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী ও যোগী। এই শ্লোকের মাধ্যমে গীতা সন্ন্যাসের প্রচলিত ধারণাকে আমূল পরিবর্তন করেছে। এখানে নিবৃত্তি মানে সংসার ত্যাগ নয়; বরং সংসারের মধ্যেই থেকে আসক্তিমুক্ত জীবনযাপন করাকেই বোঝায়।

পঞ্চমত, শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান ও ভক্তির মাধ্যমেও প্রবৃত্তি–নিবৃত্তির সমন্বয় সাধন করেন। আত্মজ্ঞান মানুষকে কর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে সাহায্য করে এবং ভক্তি কর্মকে ঈশ্বরার্পণে রূপান্তরিত করে। কৃষ্ণ বলেন—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥"[১৫] (গীতা ৯.২৭)

অর্থাৎ মানুষের সমস্ত কর্ম ঈশ্বরকে সমর্পিত হলে তা আর বন্ধনের কারণ হয় না। ফলে কর্ম এবং বৈরাগ্য একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে।

দার্শনিকভাবে বিচার করলে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ ভারতীয় চিন্তাধারায় এক বৈপ্লবিক অবদান। বৈদিক কর্মমার্গ এবং উপনিষদীয় জ্ঞানমার্গের মধ্যে যে আপাত বিরোধ ছিল, গীতা তার সমন্বয় সাধন করেছে। এখানে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিকে দুটি পৃথক পথ নয়; বরং একই আধ্যাত্মিক যাত্রার পরস্পর-সম্পূরক দুটি দিক হিসাবে দেখ হয়। প্রবৃত্তি মানুষকে সমাজ ও কর্তব্যের সঙ্গে যুক্ত রাখে, আর নিবৃত্তি তাকে আসক্তি ও অহংকার থেকে মুক্ত রাখে।

অতএব, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের মূল প্রতিপাদ্য হলো— মানবজীবনের আদর্শ কর্মত্যাগে নয়, বরং নিষ্কাম কর্মে। জগত থেকে পলায়নে নয়, বরং জগতের মধ্যেই অনাসক্তচিত্তে কর্তব্য পালনে। এই সমন্বিত দর্শনের মধ্য দিয়েই গীতা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির দ্বন্দ্বের সমাধান করে এবং মানবজীবনের জন্য এক সর্বজনীন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পথনির্দেশ প্রদান করে।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন— যুদ্ধ তার স্বধর্ম বা কর্তব্য। যুদ্ধ না করলে সে অধর্মের সহযোগী হবে। নিষ্ক্রিয় থাকা বা নিবৃত্তির পথে পালানো প্রকৃত বৈরাগ্য নয়। প্রকৃত নিবৃত্তি হলো কর্মের মধ্যে থেকে আসক্তিহীন থাকা।

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥"[১৬] (গীতা ৩.১৯)

---

[১৩] ঘোষ, শ্রী জগদীশ চন্দ্র। শ্রীগীতা । প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী (২০১৮), পৃঃ- ৮৬

[১৪] রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী । ভাগবদগীতা ও বিশ্বজনীন বার্তা (২য় খণ্ড) কলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয় । পৃঃ-১০২

[১৫] রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী । ভাগবদগীতা ও বিশ্বজনীন বার্তা (২য় খণ্ড) কলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয় । পৃঃ-৩৮৮

[১৬] রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী । ভাগবদগীতা ও বিশ্বজনীন বার্তা (১ম খণ্ড) কলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয় । পৃঃ-২৭৭

"অতএব আসক্তিহীন হয়ে কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান কর; কারণ আসক্তিহীনভাবে কর্ম সম্পাদন করেই মানুষ পরম লক্ষ্য অর্থাৎ মুক্তি লাভ করে।" কর্মযোগ হল গীতার নৈতিক দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু, যেখানে কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মকে আত্মোন্নয়ন ও মুক্তিলাভের উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি।।"[১৭] (গীতা ২.৪৭)

অর্থাৎ মানুষের অধিকার তার কর্মে, কখনই তার ফলে নয়। তোমার আসক্তি যেন অকর্মের প্রতি না হয়। এই শিক্ষা কর্মবিমুখতার নয়; বরং ফলকেন্দ্রিক মানসিকতার বিরুদ্ধে। গীতার মতে, কর্মের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কর্তব্যপালন, আত্মশুদ্ধি এবং লোকসংগ্রহ। এখানে প্রবৃত্তি একটি নৈতিক চরিত্র লাভ করে। কারণ কর্ম কেবল অর্থোপার্জনের মাধ্যম নয়; বরং কর্ম হল আত্মবিকাশের উপায় স্বরূপ।

জ্ঞানযোগ মানুষের অন্তর্নিহিত আত্মস্বরূপ উপলব্ধির পথ। গীতায় আত্মার অমরত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বাহভবিতা বা ন ভূয়ঃ।"[১৮] (গীতা ২.২০)

অর্থাৎ আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। এই জ্ঞান মানুষকে ভয়, মোহ ও আসক্তি থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে। জ্ঞানযোগ নিবৃত্তির ভিত্তি, কারণ এটি মানুষকে জাগতিক পরিচয়ের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে শেখায়।
ভক্তিযোগ গীতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান। কর্ম ও জ্ঞানকে কার্যকর করার জন্য ভক্তি এক আবেগিক শক্তি প্রদান করে। শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।"[১৯] (গীতা ১৮.৫৫)

অর্থাৎ ভক্তির মাধ্যমে আমায় যথার্থভাবে জানা যায়। ভক্তি এখানে অন্ধ বিশ্বাস নয়; বরং আত্মসমর্পণ, বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিক সম্পর্কের প্রকাশ।

বর্তমান যুগে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, যোগাযোগ এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটেছে। মানুষের জীবনযাত্রা আগের তুলনায় অনেক বেশি গতিশীল ও সুবিধাসম্পন্ন হয়েছে। তৎসত্ত্বেও এর পাশাপাশি মানসিক চাপ, উদ্বেগ, নৈতিক অবক্ষয়, আত্মকেন্দ্রিকতা এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মতো নানা সমস্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পার্থিব অগ্রগতির এই যুগে মানুষ প্রায়ই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, মূল্যবোধ এবং মানসিক শান্তির সন্ধানে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এই পটভূমিতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শিক্ষা নতুনভাবে তাৎপর্য লাভ করে।

গীতার অন্যতম প্রধান শিক্ষা হলো কর্তব্যনিষ্ঠ কর্ম। গীতা মানুষকে কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হতে নয়, বরং কর্মের ফলের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি পরিহার করে নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের কর্তব্য পালন করতে উৎসাহিত করে। Dr. S.N.Dasgupta বলেন যে, "গীতার অনন্যতা এই যে এটি কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং পরিপূরক হিসাবে উপস্থাপন করেছে।"[২০] এই শিক্ষা আধুনিক কর্মজীবনের চাপ, প্রতিযোগিতা এবং সাফল্য-ব্যর্থতার উদ্বেগ মোকাবিলায় বিশেষভাবে সহায়ক। কর্মযোগের আদর্শ ব্যক্তি-মানুষকে কর্মে সক্রিয় থাকার পাশাপাশি মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করতে শেখায়।

অন্যদিকে, জ্ঞানযোগ আত্মপরিচয় ও আত্মসচেতনতার গুরুত্ব তুলে ধরে। আধুনিক সমাজে মানুষ বহির্জগতের নানা আকর্ষণ ও ব্যস্ততার মধ্যে নিজের প্রকৃত সত্তা এবং জীবনের গভীর অর্থ সম্পর্কে সচেতনতা

---

[১৭] রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী । ভাগবদগীতা ও বিশ্বজনীন বার্তা (১ম খণ্ড) কলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয় । পৃঃ-১৭০
[১৮] রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী । ভাগবদগীতা ও বিশ্বজনীন বার্তা (১ম খণ্ড) কলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয় । পৃঃ-১২১
[১৯] রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী । ভাগবদগীতা ও বিশ্বজনীন বার্তা (৩য় খণ্ড) কলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয় । পৃঃ-৩২৯
[২০] Dasgupta,S.N. (1975) A History of Indian Philosophy(vol-1), Motilal Banarsidass p-387

হারিয়ে ফেলে। জ্ঞানযোগ মানুষকে আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি, সীমাবদ্ধতা এবং জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি অর্জনে সহায়তা করে।

ভক্তিযোগও সমকালীন জীবনে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। অনিশ্চয়তা, হতাশা এবং মানসিক অস্থিরতার সময়ে ঈশ্বরের প্রতি আস্থা, আত্মসমর্পণ এবং ভক্তি মানুষের মনে আশা, সাহস এবং চিত্তশান্তির জন্ম দেয়। ভক্তিযোগ কেবল ধর্মীয় অনুশীলন নয়; এটি মানুষের অন্তর্জগতকে সুসংহত ও স্থিতিশীল করে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

এছাড়া গীতায় আলোচিত 'লোকসংগ্রহ'-এর আদর্শ ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে এক সৃজনশীল সম্পর্ক স্থাপনের শিক্ষা দেয়। গীতা মনে করে যে ব্যক্তির উন্নতি কখনোই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; বরং সমাজের কল্যাণে অবদান রাখার মধ্য দিয়েই ব্যক্তিজীবনের প্রকৃত সার্থকতা অর্জিত হয়। বর্তমান সময়ে যখন সামাজিক দায়িত্ববোধ, সহমর্মিতা এবং মানবিক মূল্যবোধ নানা কারণে দুর্বল হয়ে পড়ছে, তখন গীতার এই শিক্ষা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

অতএব, গীতার জীবনদর্শন কেবল একটি ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক গ্রন্থের শিক্ষায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি আধুনিক মানুষের নৈতিক, মানসিক এবং সামাজিক সমস্যার মোকাবিলায় একটি কার্যকর দার্শনিক পথনির্দেশ প্রদান করে। কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বিত আদর্শ ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্যই একটি সুষম, অর্থবহ এবং মূল্যবোধনির্ভর জীবন গঠনে সহায়ক হতে পারে।

গীতার দর্শন সমন্বয়বাদী হলেও কিছু সমালোচক মনে করেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রদত্ত উপদেশকে সার্বজনীন নৈতিক আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা প্রশ্নসাপেক্ষ। তবে গীতার মূল শিক্ষা যুদ্ধকে সমর্থন করে না; বরং কর্তব্য, নৈতিকতা এবং অনাসক্তির ভিত্তিতে জীবন পরিচালনার শিক্ষা প্রদান করে।

অন্যদিকে গীতার শিক্ষাকে কখনও কখনও খুব বেশী আধ্যাত্মিক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এর নৈতিক, মনোবৈজ্ঞানিক এবং সামাজিক তাৎপর্য অত্যন্ত বাস্তবধর্মী। এই কারণেই গীতা শুধুমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থ নয় গীতা হল আমাদের মানবজীবনের একটি দার্শনিক নির্দেশিকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এমন এক জীবনদর্শন উপস্থাপন করে, যেখানে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং পরস্পরের পরিপূরক। গীতার মতে মানবজীবনের পূর্ণতা কেবল কর্মে নয়, কেবল ত্যাগেও নয়, বরং কর্মের মধ্যেই অনাসক্তির সাধনায় লাভ করা যায়।

প্রবৃত্তি মানুষকে সমাজ, কর্তব্য ও কর্মের সঙ্গে যুক্ত করে। নিবৃত্তি মানুষকে আত্মজ্ঞান, সংযম ও মুক্তির দিকে পরিচালিত করে। গীতা এই দুইয়ের সমন্বয়ের মাধ্যমে এমন এক জীবনপথ নির্দেশ করে, যা নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক— তিন ক্ষেত্রেই মানবজীবনের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম।

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তিবুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।[২১] (গীতা ১৮. ৩০)

আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে বর্তমান বিশ্বজনীন পরিবেশে নৈতিক অনিশ্চয়তা, মানসিক চাপ এবং মূল্যবোধগত সংকটের মুখোমুখি মানবসমাজের জন্য গীতার সমন্বিত জীবনদর্শন একটি তাৎপর্যপূর্ণ দার্শনিক ও নৈতিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

[২১] রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী । ভাগবদগীতা ও বিশ্বজনীন বার্তা (৩য় খণ্ড) কলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয় । পৃঃ- ২৭৬

গ্রন্থপঞ্জি:

১. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ। (২০১৪)। ভারতীয় দর্শন। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।
২. দাসগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ। (২০১১)। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।
৩. রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী। ভাগবৎগীতা ও বিশ্বজনীন বার্তা, উদ্বোধন কার্যালয়
৪. ভট্টাচার্য, রামরঞ্জন। (২০১৮)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা: দর্শন ও জীবনবোধ। কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো।
৫. সরকার, স্বামী জগদীশ্বরানন্দ (অনুবাদক)। (২০২০)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
৬. গম্ভীরানন্দ, স্বামী। (২০১৭)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা: শাঙ্করভাষ্যসহ। কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
৭. রাধাকৃষ্ণন, সর্বপল্লী। (২০১৬)। ভারতীয় দর্শন (অনুবাদ সংস্করণ)। কলকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স।
৮. বিবেকানন্দ, স্বামী। (২০১৫)। কর্মযোগ। কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
৯. বিবেকানন্দ, স্বামী। (২০১৫)। জ্ঞানযোগ। কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।
১০. তিলক, বালগঙ্গাধর। (২০১২)। গীতা রহস্য (বাংলা অনুবাদ)। কলকাতা, সাহিত্য সংসদ।
১১. মিত্র, সুশীলকুমার। (২০১৮)। গীতার নৈতিক দর্শন। কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।